# অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু

টিপু ভূগোলের বইটা বন্ধ করে ঘড়ির দিকে দেখল। সাতচল্লিশ মিনিট পড়া হয়ে গেছে একটানা। এখন তিনটে বেজে তেরো মিনিট। এবার যদি ও একটু ঘুরে আসে তাহলে ক্ষতি কী? ঠিক এমনি সময় তো সেদিন লোকটা এসেছিল। সে তো বলেছিল টিপুর দুঃখের কারণ হলে তবে আবার আসবে। তাহলে? কারণ তো হয়েছে। বেশ ভালো রকমই হয়েছে। যাবে নাকি একবার বাইরে?

নাঃ। মা বারান্দায় বেরিয়েছেন কিসের জন্য জানি। হুস করে একটা কাক তাড়ালেন এক্ষুনি। তারপর ক্যাঁচ শব্দটায় মনে হল বেতের চেয়ারটায় বসলেন। বোধহয় রোদ পোয়াচ্ছেন। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

লোকটার কথা মনে পড়ছে টিপুর। এমন লোক টিপু কোনোদিন দেখেনি। ভীষণ বেঁটে, গোঁফদাড়ি নেই, কিন্তু বাচ্চা নয়। বাচ্চাদের এমন গম্ভীর গলা হয় না। তাহলে লোকটা বুড়ো কি? সেটাও টিপু বুঝতে পারেনি। চামড়া কুঁচকোয়নি কোথাও। গায়ের রং চন্দনের সঙ্গে গোলাপী মেশালে যেমন হয় তেমনি। টিপু মনে মনে ওকে গোলাপীবাবু বলেই ডাকে। লোকটার আসল নাম টিপু জানে না। জানতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা বলল, 'কী হবে জেনে? আমার নাম উচ্চারণ করতে তোমার জিভ জড়িয়ে যাবে।'

টিপু বেশ রেগে গিয়েছিল। 'কেন, জড়িয়ে যাবে কেন? আমি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলতে পারি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলতে পারি, এমন-কি ফ্লক্সিনসিনিহিলিপিলিফিকেশন বলতে পারি, আর তোমার নাম বলতে পারব না?' তাতে লোকটা বলল, 'একটা জিভে আমার নাম উচ্চারণ হবে না।'

'তোমার বুঝি একটার বেশি জিভ আছে?' জিজ্ঞেস করেছিল টিপু।

'বাংলা বলতে একটার বেশি দরকার হয় না।'

suman_ahm@yahoo.com

বাড়ির পিছনে যে নেড়া শিরীষ গাছটা আছে, তারই নীচে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। এদিকটা বড় একটা কেউ আসে না। শিরীষ গাছটার পিছনে খোলা মাঠ, তারও পিছনে ধান ক্ষেত, আর তারও অনেক, অনেক পিছনে পাহাড়ের সারি। কদিন আগেই টিপু এদিকটায় এসে একটা ঝোপের ধারে একটা বেজিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিল। আজ হাতে কিছু পাঁউরুটির টুকরো নিয়ে এসেছিল ঝোপটার ধারে ছড়িয়ে দেবার জন্য, যদি তার লোভে বেজিটা আবার দেখা দেয়। এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়ল গাছতলায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে। চোখাচুখি হতেই লোকটা ফিক্ করে হেসে বলল, 'হ্যালো।'

সাহেব নাকি ? সাহেব হলে কথা বলে বেশিদূর এগোনো যাবে না, তাই টিপু কিছুক্ষণ কিছু না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার লোকটাই ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার কোনো দুঃখ আছে ?'

'দুঃখ ?'

'দুঃখ।'

টিপু তো অবাক। এমন প্রশ্ন তাকে কেউ কোনোদিন করেনি। সে বলল, 'কই, না তো। দুঃখ তো নেই।'

'ঠিক বলছ ?'

'বা রে, ঠিক বলব না কেন ?'

'তোমার তো দুঃখ থাকার কথা। হিসেব করে তো তাই বেরোল।'

'কী রকম দুঃখ ? ভেবেছিলাম বেজিটাকে দেখতে পাব, কিন্তু পাচ্ছি না। সেরকম দুঃখ ?'

'উহুঁ উহুঁ। যে-দুঃখে কানের পিছনটা নীল হয়ে যায়, হাতের তেলো শুকিয়ে যায়, সেরকম দুঃখ।'

'মানে ভীষণ দুঃখ ?'

'হ্যাঁ।'

'না, সেরকম দুঃখ নেই।'

লোকটা এবার নিজে দুঃখ দুঃখ ভাব করে মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, তাহলে এখনো মুক্তি নেই।'

'মুক্তি ?'

'মুক্তি। ফ্রীডম।'

'ফ্রীডম মানে মুক্তি সেটা আমি জানি,' বলল টিপু। 'আমার দুঃখ হলে বুঝি তোমার মুক্তি হবে ?'

লোকটা টিপুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলল, 'তোমার বয়স সাড়ে দশ ?'

'হ্যাঁ,' বলল টিপু।

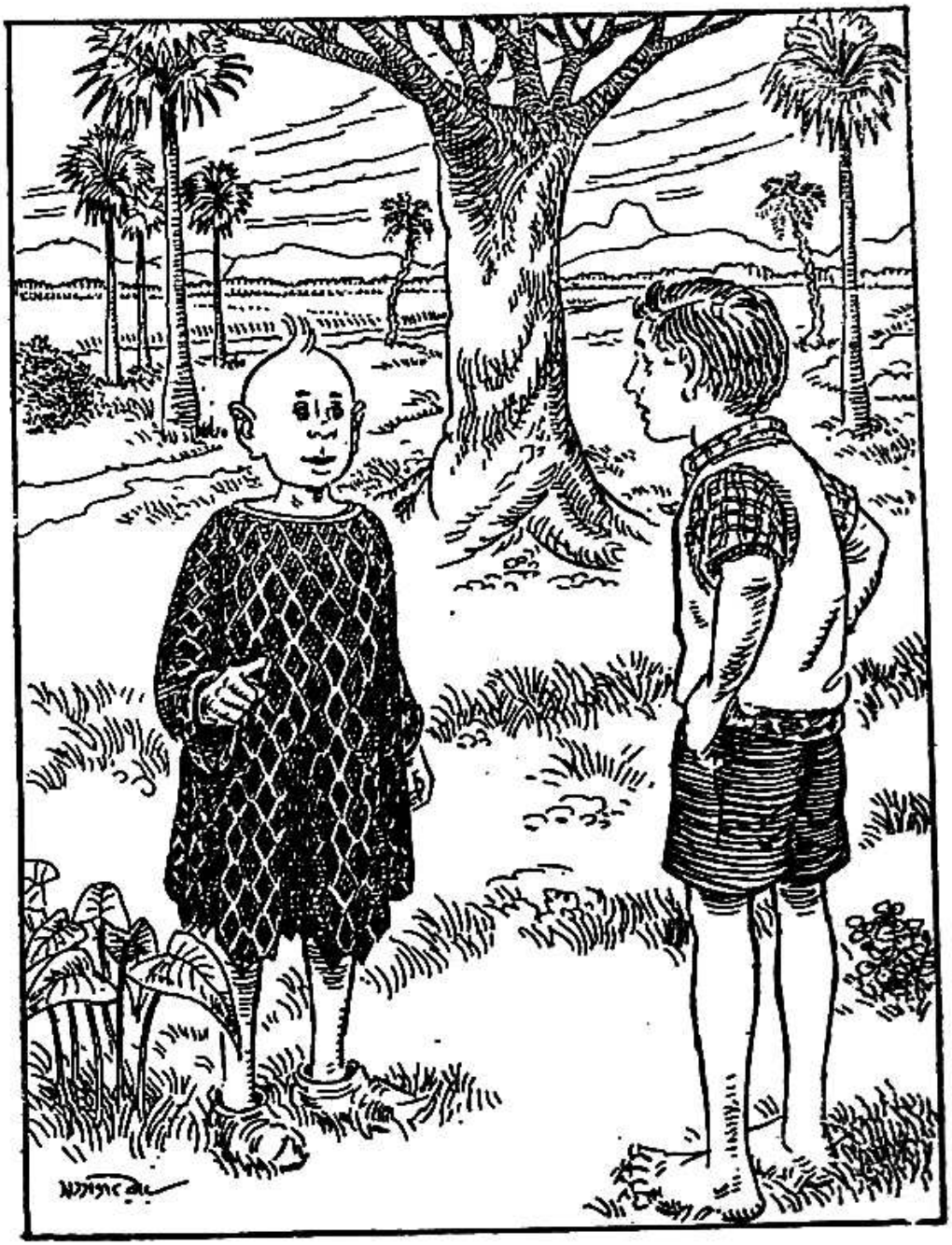

'আর নাম শ্রীমান তর্পণ চৌধুরী ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কোনো ভুল নেই।'

লোকটা যে ওর বিষয়ে এত খবর পেলো কোত্থেকে সেটা টিপু বুঝতে পারল না। টিপু বলল, 'শুধু আমার দুঃখ হলেই তোমার মুক্তি ? আর কারুর দুঃখে নয় ?'

'দুঃখে মুক্তি নয়, দুঃখ দূর করলে তবে মুক্তি।'

'কিন্তু দুঃখ তো অনেকের আছে। আমাদের বাড়িতে নিকুঞ্জ ভিখিরি এসে একতারা বাজিয়ে গান গায়। সে বলে তার তিন কুলে কেউ নেই। তার তো খুব দুঃখ।'

'তাতে হবে না,' লোকটা মাথা নেড়ে বলল। 'তর্পণ চৌধুরী, বয়স সাড়ে দশ—এখানে তুমি ছাড়া আর কেউ আছে ?'

'বোধ হয় না।'

'তবে তোমাকেই চাই।'

এবার টিপু একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

'তুমি কিসের থেকে মুক্তির কথা বলছ ? তুমি তো দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছ।'

'এটা আমার দেশ নয়। এখানে তো আমায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।'

'কেন ?'

'অত জানার কী দরকার তোমার ?'

'বা রে, একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হল, আর তার বিষয় জানতে ইচ্ছা করবে না ? তুমি কোথায় থাক, কী কর, কী নাম তোমার, আর কে কে চেনে তোমাকে—সব জানতে ইচ্ছা করছে আমার।'

'অত জানলে জিঞ্জিরিয়া হবে।'

লোকটা আসলে জিঞ্জিরিয়া বলেনি ; বলেছিল একটা ভীষণ কঠিন কথা যেটা টিপু চেষ্টা করলেও উচ্চারণ করতে পারবে না। তবে খুব সহজ করে বললে সেটা জিঞ্জিরিয়াই হয়। না জানি কী ব্যারামের কথা বলছে, তাই টিপু আর ঘাঁটাল না। কার কথা মনে হচ্ছে লোকটাকে দেখে ? রামখেল তিলক সিং ? নাকি ঘ্যাঁঘাসুরের সেই একহাত লম্বা লোকটা, যার সঙ্গে মানিকের দেখা হয়েছিল ? নাকি স্নো হোয়াইটের সেই সাতটা বামনের একটা বামন ? টিপু রূপকথার পোকা। তার দাদু প্রতিবারই পুজোয় কলকাতা থেকে আসার সময় তার জন্য তিন-চারখানা করে রূপকথার বই এনে দেন। টিপুর মনটা সে সব পড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী ছত্রিশ পাহাড় পেরিয়ে

কোথায় যেন উড়ে চলে যায়। সে নিজেই হয়ে যায় রাজপুত্তুর—তার মাথায় মুক্তো বসানো পাগড়ি আর কোমরে হীরে বসানো তলোয়ার। কোনোদিন চলেছে গজমোতির হার আনতে, কোনোদিন ড্র্যাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

'গুড বাই।'

সে কী, লোকটা যে চলল!

'কোথায় থাক তুমি, বললে না?'

লোকটা তার প্রশ্নে কান না দিয়ে শুধু বলল, 'তোমার দুঃখ হলে তখন আবার দেখা হবে।'

'কিন্তু তোমায় খবর দেব কী করে?'

ততক্ষণে লোকটা এক লাফে একটা দেড় মানুষ উঁচু কুল গাছ টপ্‌কে হাইজাম্পে ওয়ার্লড রেকর্ড করে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এটা প্রায় দেড়মাস আগের ঘটনা। তারপর থেকে লোকটা আর আসেনি। কিন্তু এখন তো আসা দরকার, কারণ টিপুর সত্যিই দুঃখের কারণ হয়েছে। আর সেই কারণ হল তাদের ইস্কুলের নতুন অঙ্কের মাস্টার নরহরিবাবু।

নতুন মাস্টারমশাইকে টিপুর এমনিতেই ভালো লাগেনি। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকে কিছু বলার আগে প্রায় দুমিনিট খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সারা ক্লাসের ছাত্রদের উপর যেভাবে চোখ বোলালেন তাতে মনে হয় যেন আগে সকলকে ভস্ম করে তারপর পড়াতে শুরু করবেন। তাল গাছের হুসুর মুসুরের মতো এমন ঝাঁটা গোঁফ যে সত্যি-মানুষের হয় সেটা টিপু জানতই না। তার ওপর ওরকম মুখে-হাঁড়িধরা গলার আওয়াজ। ক্লাসের কেউই তো কালা নয়, তাহলে অত হুমকিয়ে কথা বলার দরকারটা কী?

আসল গোলমালটা হল দুদিন পরে, বিষ্যুদবারে। দিনটা ছিল মেঘলা, তার উপর পৌষ মাসের শীত। টিফিনের সময় টিপু ক্লাস থেকে না বেরিয়ে নিজের ডেস্কে বসে পড়ছিল ডালিমকুমারের গল্প। কে জানত ঠিক সেই সময়ই অঙ্কের স্যার ক্লাসের পাশ দিয়ে যাবেন, আর তাকে দেখতে পেয়েই ক্লাসে ঢুকে আসবেন?

'ওটা কী বই, তর্পণ?'

স্যারের স্মরণশক্তি যে সাংঘাতিক সেটা বলতেই হবে, কারণ দুদিনেই সব ছাত্রদের নাম মুখস্ত হয়ে গেছে।

টিপুর বুকটা দুরদুর করলেও, টিফিনে গল্পের বই পড়াটা দোষের নয় মনে করে সে বলল, 'ঠাকুরমার ঝুলি, স্যার।'

'কই দেখি।'

টিপু বইটা দিয়ে দিল স্যারের হাতে। স্যার মিনিটখানেক ধরে সেটা

উলটেপালটে দেখে বললেন, 'হাঁউ মাউ কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ, হীরের গাছে মোতির পাখি, শামুকের পেটে রাজপুত্তুর—এসব কী পড়া হচ্ছে শুনি ? যত আজগুবি ধাপ্পাবাজি ! এসব পড়লে অঙ্ক মাথায় ঢুকবে কেমন করে, অ্যাঁ ?'

'এ তো গপ্প, স্যার,' টিপু কোনোরকমে গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে বলল।

'গপ্প ? গপ্পর তো একটা মাথামুণ্ডু থাকবে, নাকি যেমন তেমন একটা লিখলেই হল ?'

টিপু অত সহজে হার মানতে চাইছিল না। বলল, 'রামায়ণেও তো আছে হনুমান জাম্বুবান, আর মহাভারতে বক রাক্ষস আর হিড়িম্বা রাক্ষসী আর আরো কত কী।'

'জ্যাঠামো কোরো না,' দাঁত খিঁচিয়ে বললেন নরহরি স্যার। 'ওসব হল মুনি-ঋষিদের লেখা, দুহাজার বছর আগে। সে তো গণেশ ঠাকুরেরও—মানুষের গায়ে হাতির মাথা, আর মা দুর্গার দশটা হাত। ও জিনিস আর তোমার এ মনগড়া গাঁজাখুরি গপ্প এক জিনিস নয়। তোমরা এখন পড়বে মনীষীদের জীবনী, ভালো ভালো ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কারের কথা, মানুষ কী করে ছোট থেকে বড় হয়েছে সেই সব কথা। তোমাদের বয়সে বাস্তব কথার দাম হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তোমরা হলে বিংশ শতাব্দীর ছেলে। আদ্যিকালের পল্লীগ্রামে যে জিনিস চলত সে জিনিস আজ শহরে চলবে কী করে ? এসব পড়তে হলে পাততাড়ি নিয়ে পাঠশালায় গিয়ে বসতে হবে, আর দুলে দুলে কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া মুখস্ত করতে হবে। সে সব পারবে তুমি ?'

টিপু চুপ করে রইল। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত কথা শুনতে হবে সেটা ভাবতে পারেনি।

'ক্লাসে আর কে কে এসব বই পড়ে ?' অঙ্ক স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

সত্যি বলতে কি, আর কেউই প্রায় পড়ে না। শীতল একবার টিপুর কাছ থেকে হিন্দুস্থানী উপকথা ধার নিয়ে গিয়েছিল, পরদিনই ফেরত দিয়ে বলল, 'ধুস্, এর চেয়ে অরণ্যদেব ঢের ভালো।'

'আর কেউ পড়ে না স্যার,' বলল টিপু।

'হুঁ।...তোমার বাবার নাম কী ?'

'তারানাথ চৌধুরী।'

'কোথায় থাক তোমরা ?'

'স্টেশন রোড। পাঁচ নম্বর।'

'হুঁ।'

বইটা ঠক্ করে ডেস্কের উপর ফেলে দিয়ে অঙ্ক স্যার চলে গেলেন।

ইস্কুলের পর টিপু সোজা বাড়ি ফিরল না। ইস্কুলের পুব দিকে ঘোষেদের আম

বাগানটা ছাড়িয়ে বিষ্ণুরাম দাসের বাড়ির বাইরে বাঁধা সাদা ঘোড়াটার দিকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল জামরুল গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। বিষ্ণুরামবাবুর বিড়ির কারখানা আছে। ঘোড়ায় চড়ে কারখানায় যান। বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু এখনো মজবুত শরীর।

টিপু প্রায়ই এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে দেখে, কিন্তু আজ আর কিছু ভালো লাগছিল না। তার মন বলছে অঙ্ক স্যার তার গল্পের বই পড়া বন্ধ করার মতলব করছেন। গল্পের বই না পড়ে সে থাকবে কী করে ? সারা বছরের একটা দিনও তার গল্পের বই পড়া বন্ধ থাকে না, আর সবচেয়ে ভালো লাগে ওইসব বইগুলো, যেগুলোকে অঙ্ক স্যার বললেন আজগুবি আর গাঁজাখুরি। কই, ও তো এসব বই পড়েও অঙ্কেতে কোনোদিন খারাপ করেনি। গত পরীক্ষায় পঞ্চাশে চুয়াল্লিশ পেয়েছিল। আর আগের অঙ্কের স্যার ভূদেববাবুর কাছে তো অঙ্কের জন্য কোনোদিন ধমক খেতে হয়নি !

শীতকালের দিন ছোট বলে এমনিতেই টিপু এবার বাড়ি ফিরবে ভাবছিল, এমন সময় একটা ব্যাপার দেখে ঝট্ করে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিতে হল।

অঙ্ক স্যার নরহরিবাবু বই ছাতা বগলে এদিকেই আসছেন।

তাহলে কি ওঁর বাড়ি এই দিকেই ? বিষ্ণুরামবাবুর বাড়ির পরে আরো গোটা পাঁচেক বাড়ি আছে অবিশ্যি এ রাস্তায়। তারপরেই হামলাটুনির মাঠ। ওই মাঠের পুব দিকে এককালে রেশমের কুঠি ছিল। হ্যামিলটন সাহেব ছিলেন তার ম্যানেজার। ভয়ংকর কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি। বত্রিশ বছর ম্যানেজারি করে কুঠির পাশেই তাঁর বাংলোতে মারা যান। তাঁর নামেই ওই মাঠের নাম হয়ে গেছে হামলাটুনির মাঠ।

আলো পড়ে আসা পৌষ মাসের বিকেলে জামরুল গাছের আড়াল থেকে ও দেখছে নরহরি স্যারকে। ভারী অবাক লাগছে তাঁর হাবভাব দেখে। স্যার এখন বিষ্ণুরামবাবুর ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ঠোঁট ছুঁচোল করে চুক্ চুক্ শব্দ করে ঘোড়ার কাঁধে হাত বুলোচ্ছেন।

এমন সময় খুট্ করে বাড়ির সদর দরজা খোলার শব্দ হল, আর বিষ্ণুরামবাবু নিজেই চুরুট হাতে করে বেরিয়ে এলেন।

'নমস্কার।'

ঘোড়ার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে অঙ্ক স্যার বিষ্ণুরামবাবুর দিকে ফিরলেন। বিষ্ণুরামবাবুও নমস্কার করে বললেন, 'এক হাত হবে নাকি ?'

'সেই জন্যেই তো আসা,' বললেন অঙ্ক স্যার। তার মানে অঙ্ক স্যার দাবা খেলেন। বিষ্ণুরামবাবু যে খেলেন সেটা টিপু জানে। অঙ্ক স্যার এবার বললেন, 'দিব্যি ঘোড়াটি আপনার। পেলেন কোত্থেকে ?'

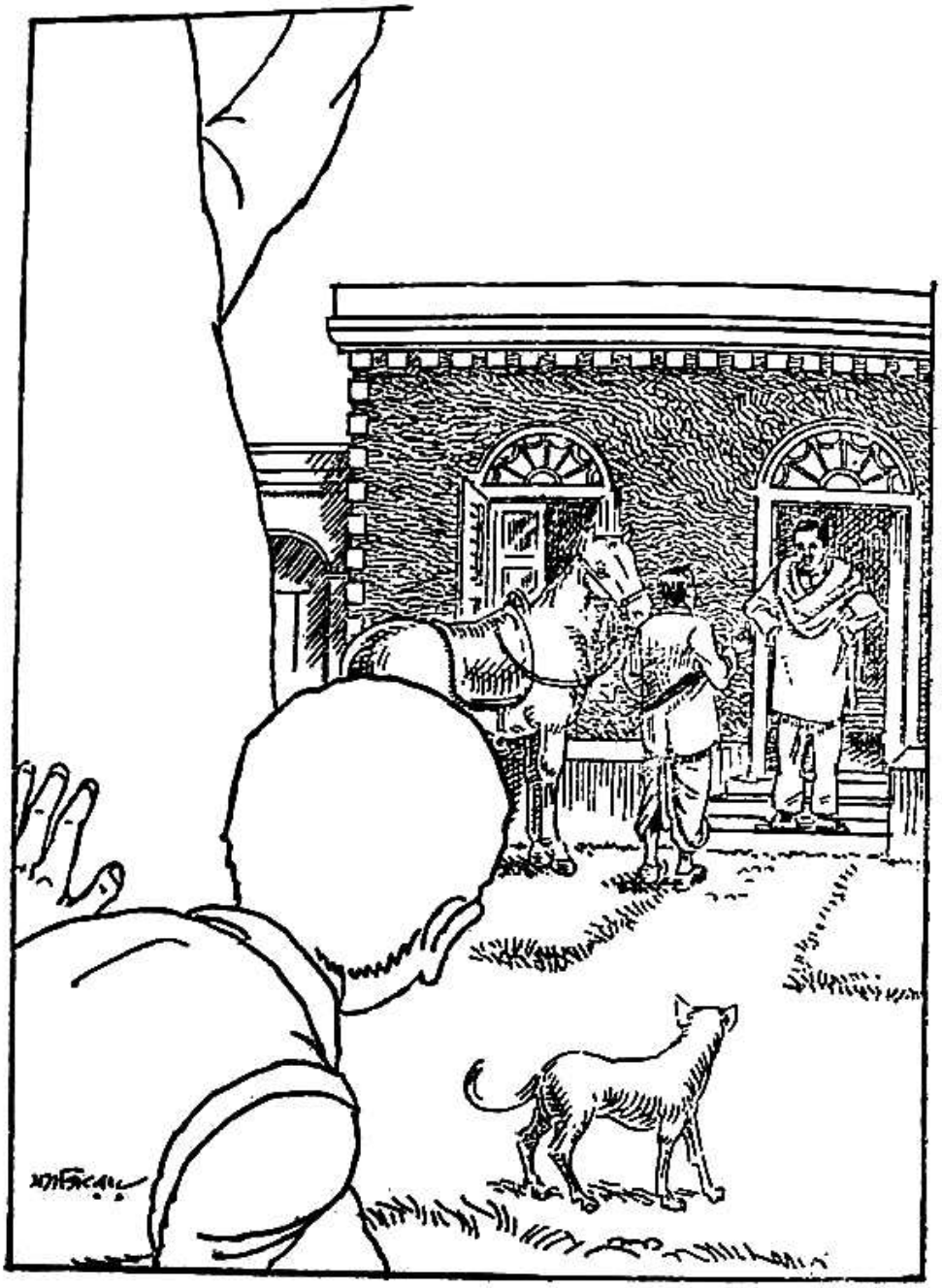

'কলকাতা। শোভাবাজারের দ্বারিক মিত্তিরের ছিল ঘোড়াটা। ওনার কাছ থেকেই কেনা। রেসের মাঠে ছুটেছে এককালে। নাম ছিল পেগ্যাসাস।'

পেগ্যাসাস ? নামটা যেন চেনা চেনা মনে হল টিপুর, কিন্তু কোথায় শুনেছে মনে করতে পারল না।

'পেগ্যাসাস,' বললেন অঙ্ক স্যার। 'কিম্ভূত নাম তো মশাই।'

'ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার ওই রকমই নাম হয়। হ্যাপি বার্থডে, শোভান আল্লা, ফরগেট-মি-নট...'

'আপনি চড়েন এ ঘোড়া ?'

'চড়ি বৈকি। তালেবর ঘোড়া। একটি দিনের জন্যেও বিগড়োয়নি।'

অঙ্ক স্যার চেয়ে আছেন ঘোড়াটার দিকে। বললেন, 'আমি এককালে খুব চড়েছি ঘোড়া।'

'বটে ?'

'তখন আমরা শেরপুরে। বাবা ছিলেন ডাক্তার। ঘোড়ায় চেপে রুগী দেখতে যেতেন। আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। সুযোগ পেলেই চড়তুম। ওঃ, সে কি আজকের কথা !'

'চড়ে দেখবেন এটা ?'

'চড়ব ?'

'চড়ুন না।'

টিপু অবাক হয়ে দেখল অঙ্ক স্যার হাত থেকে বই ছাতা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে ঘোড়ার দড়িটা খুলে এক ঝটকায় সেটার পিঠে চড়ে বসলেন। তারপর বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পাশে দুবার চাপ দিতেই সেটা খট্ খট্ করে চলতে আরম্ভ করল।

'দেখবেন, বেশিদূর যাবেন না,' বললেন বিষ্ণুরামবাবু।

'আপনি ঘুঁটি সাজান গিয়ে,' বললেন অঙ্ক স্যার, 'আমি খানিকদূর গিয়েই ঘুরে আসছি।'

টিপু আর থামল না। আজ একটা দিন গেল বটে।

কিন্তু ঘটনার শেষ এখানেই নয়।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। টিপু পরের দিনের পড়া শেষ করে সবে ভাবছে এবার গল্পের বইটা খুলবে কিনা, এমন সময় বাবা ডাক দিলেন নীচ থেকে।

টিপু নীচে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখে নরহরি স্যার বসে আছেন বাবার সঙ্গে। টিপুর রক্ত হিম হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'তোমার দাদুর দেওয়া যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো ইনি একবার চাইছেন। যাও তো নিয়ে এসো গিয়ে।'

টিপু নিয়ে এল। সাতাশখানা বই। তিন খেপে আনতে হল।

অঙ্ক স্যার ঝাড়া দশ মিনিট ধরে বইগুলো দেখলেন। মাঝে মাঝে মাথা নাড়েন আর হুঁঃ করে একটা শব্দ করেন। তারপর বইগুলো রেখে দিয়ে বললেন—

'দেখুন মিস্টার চৌধুরী, আমি যেটা বলছি সেটা আমার অনেক দিনের চিন্তা-গবেষণার ফল। ফেয়ারি টেইল বলুন আর রূপকথাই বলুন আর উপকথাই বলুন, এর ফল হচ্ছে একই—ছেলেমেয়েদের মনে কুসংস্কারের বীজ বপন করা। শিশুমনকে যা বোঝাবেন তাই তারা বুঝবে। সেখানে আমাদের বড়দের দায়িত্বটা কতখানি সেটা একবার ভেবে দেখুন! আমরা কি তাদের বোঝাব, বোয়াল মাছের পেটে থাকে মানুষের প্রাণ? যেখানে আসল কথাটা হচ্ছে যে প্রাণ থাকে মানুষের হৃৎপিণ্ডে—তার বাইরে কোথাও থাকতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়।'

বাবা পুরোপুরি কথাটা মানছেন কিনা সেটা টিপু বুঝতে না পারলেও, এটা সে জানে যে ইস্কুলের মাস্টারদের কথা যে মেনে চলতে হয়, এটা তিনি বিশ্বাস করেন। 'ছেলে বয়সটা মেনে চলারই বয়স, টিপু,' এ কথা বাবা অনেকবার বলেছেন। 'বিশেষ করে গুরুজনদের কথা মানতেই হবে। নিজের ইচ্ছে মতো সব কিছু করার বয়সও আছে একটা, কিন্তু সেটা পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর। তখন তোমাকে কেউ বলবে না এটা কর, ওটা কর। বা বললেও, সেখানে তোমার নিজের মতটা দেবার অধিকার আছে। কিন্তু সেটা এখন নয়।'

'আপনার বাড়িতে অন্য ধরনের শিশুপাঠ্য বই নেই?' জিজ্ঞেস করলেন নরহরি স্যার।

'আছে বৈকি,' বললেন বাবা। 'আমার বুক শেল্‌ফেই আছে। আমার ইস্কুলে প্রাইজ পাওয়া বই। টিপু, তুই দেখিস্‌নি?'

'সব পড়া হয়ে গেছে বাবা,' বলল টিপু।

'সবগুলো?'

'সবগুলো। বিদ্যাসাগরের জীবনী, সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী, ক্যাপ্টেন স্কটের দক্ষিণ মেরু অভিযান, মাঙ্গো পার্কের আফ্রিকা ভ্রমণ, ইস্পাতের কথা, আকাশযানের কথা...। প্রাইজ আর কটাই বা পেয়েছ বাবা?'

'তা বেশ তো,' বললেন বাবা। 'নতুন বই এনে দেওয়া যাবেখন।'

'আপনি এখানে তীর্থঙ্কর বুক স্টলে বললে ওরা কলকাতা থেকে আনিয়ে দেবে বই,' বললেন অঙ্ক স্যার, 'সেই সবই তুমি পড়বে এবার থেকে, তর্পণ। এগুলো বন্ধ।'

এগুলো বন্ধ। ওই দুটো কথায় যেন এক মুহূর্তে পৃথিবীটা টিপুর চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল। এগুলো বন্ধ!

আর বন্ধ যাতে হয় তার জন্য বাবাও অঙ্ক স্যারের থেকে নিয়ে বইগুলো তাঁর আলমারির তাকে ভরে ফেলে চাবি বন্ধ করে দিলেন।

মা অবিশ্যি ব্যাপারটা শুনে বেশ খানিকক্ষণ গজর গজর করেছিলেন। খাবার সময় একবার তো বলে ফেললেন, 'যে লোক এমন কথা বলতে পারে তাকে মাস্টার করে রাখা কেন বাপু ?'

বাবা পরপর তিনবার উহুঁ বলে মা-কে থামিয়ে দিলেন। —'তুমি বুঝছ না। উনি যা বলছেন টিপুর ভালোর জন্যই বলছেন।'

'ছাই বলছেন।' তারপর টিপুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুই ভাবিস্‌নে রে। আমি বলব তোকে গল্প। তোর দিদিমার কাছ থেকে অনেক গল্প শুনেছি ছেলেবেলায়। সব তো আর ভুলিনি।'

টিপু কিছু বলল না। মুশকিল হচ্ছে কি, মা-র কাছে টিপু এককালে অনেক গল্পই শুনেছে। তার বাইরে মা আর কিছু জানেন বলে মনে হয় না। আর জানলেও, বই পড়ার মজা মুখে শোনা গল্পে নেই। বইয়ে ডুবে যাওয়া একটা আলাদা ব্যাপার। সেখানে শুধু গল্প আর তুমি—মাঝখানে কেউ নেই। সেটা মা-কে বোঝাবে কী করে ?

আরো দুদিন গেল টিপুর বুঝতে যে এবার সত্যি সত্যিই সে দুঃখ পাচ্ছে। গোলাপীবাবু যে দুঃখের কথা বলেছিলেন, এটা সেই দুঃখ। এবার এক উনিই যদি কিছু করতে পারেন।

আজ রবিবার। বাবা ঘুমোচ্ছেন। মা বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকে সেলাই-এর কল চালাচ্ছেন। এখন বেজেছে সাড়ে তিনটে। এখন একবার পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া যেতে পারে। লোকটা যে কেন বলে গেল না সে কোথায় থাকে ! সে না এলে টিপু সটান তার বাড়িতে চলে যেতে পারত।

টিপু পা টিপে টিপে একতলায় নেমে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

চারিদিকে রোদ ঝলমল করছে, কিন্তু তাও বেশ শীত শীত ভাব। দূরে ধান ক্ষেতে সোনালী রং ধরে আছে পাহাড়ের লাইন অবধি। একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে একটানা, আর চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দটা নিশ্চয়ই ওই শিরীষ গাছের বাসিন্দা কোনো একটা কাঠবেড়ালী করছে।

'হ্যালো।'

আরে ! কী আশ্চর্য ! কখন যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে গাছতলায় সেটা টিপু দেখতেই পায়নি।

'তোমার কানের পিছনে নীল রঙ, হাতের তেলো খস্‌খসে, বুঝতেই পারছি তোমার দুঃখের কারণ ঘটেছে।'

'তা ঘটেছে বৈকি।'

লোকটা এগিয়ে আসছে টিপুর দিকে। আবার সেই পোশাক। আবার মাথার চুলগুলো ফৎফৎ করে ঝুঁটির মতো উড়ছে বাতাসে।

'কী ঘটেছে সেটা বলতে হবে তো, নইলে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।'

টিপুর হাসি পেলেও, লোকটাকে শুধরোবার চেষ্টা না করে অঙ্ক স্যারের পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে ফেলল। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেলেও মনের জোরে নিজেকে সামলে নিল টিপু।

'হুঁ' বলে লোকটা ষোলবার ধীরে ধীরে মাথা উপর-নীচ করল। টিপু ভেবেছিল আর থামবেই না ; আর সেই সঙ্গে এও মনে হয়েছিল যে লোকটা হয়তো কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। যদি না পায় তাহলে যে কী দশা হবে সেটা ভেবে টিপুর আবার চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটা মাথা নাড়া থামিয়ে আবার 'হুঁ' বলাতে টিপুর ধড়ে প্রাণ এল।

'তুমি কিছু করতে পারবে কি ?' টিপু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ভেবে দেখতে হবে। পাকস্থলীটা খাটাতে হবে।'

'পাকস্থলী ? কেন, তোমরা মাথা খাটাও না বুঝি ?'

লোকটা কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোমার এই নরহরি স্যারকে কাল দেখলাম না মাঠে ঘোড়া চড়তে ?'

'কোন্ মাঠে ? হামলাটুনির মাঠে ?'

'যে মাঠে ভাঙা বাড়িটা আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি কি সেইখানেই থাক ?'

'ওই ভাঙা বাড়িটার পিছনেই আমার ট্রিডিঙ্গিপিডিটা রয়েছে।'

টিপু কথাটা ঠিক করে শোনেনি নিশ্চয়ই। তবে শুনলেও সেটা যে তার জিভ দিয়ে কিছুতেই বেরোত না সেটা সে জানে।

লোকটা এখনো আছে, আর আবার মাথাটা উপর-নীচ করতে আরম্ভ করেছে।

এবার একত্রিশবার নাড়াবার পর মাথা থামিয়ে লোকটা বলল, 'আজ ফুল্ মুন্। তুমি যদি ব্যাপারটা দেখতে চাও, তাহলে চাঁদ যখন মাঠের মাঝখানের খেজুর গাছটার ঠিক মাথায় আসবে তখন মাঠে এসে যেও। আড়ালে থেকো ; কেউ যেন দেখে না ফেলে। তারপর দেখা যাক কী করা যায়।'

টিপুর হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় ঢুকে তাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিল।

'তুমি অঙ্ক স্যারকে মেরে-টেরে ফেলবে না তো ?'

এই প্রথম লোকটাকে হো হো করে হাসতে দেখল টিপু, আর সেই সঙ্গে দেখল লোকটার মুখের ভিতর একটার উপর আরেকটা জিভ। আর দেখল যে

লোকটার দাঁত বলে কিচ্ছু নেই।

'মেরে ফেলব ?'—লোকটা কোনোরকমে হাসি থামাল।—'উহুঁ। আমরা কাউকে মারি-টারি না। একজনকে চিমটি কাটার কথা ভেবেছিলাম বলেই তো আমার নির্বাসন। প্রথম ছক কেটে বেরোল পৃথিবীর নাম, সেখানে হবে নির্বাসন ; তারপর ছক কেটে বেরোল এই শহরের নাম ; তারপর তোমার নাম। তোমার দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েই আমার মুক্তি।'

'ঠিক আছে, তাহলে—'

লোকটা সেদিনের মতোই টিপুর কথা শেষ হবার আগেই কুল গাছের উপর দিয়ে হাই জাম্প করে হাওয়া।

টিপুর শরীরের ভিতর সেই যে মিহি কাঁপুনি শুরু হল সেটা রইল রাত অবধি। আশ্চর্য কপাল,—আজ মা বাবা দুজনেই রাত্রে নেমন্তন্ন খেতে যাবেন সুশীলবাবুদের বাড়ি। সুশীলবাবুর নাতির মুখে ভাত। টিপুরও নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু সামনেই পরীক্ষা, তাই মা নিজেই বললেন, 'তোর আর গিয়ে কাজ নেই। বাড়িতে বসে পড়াশুনা কর।'

সাড়ে সাতটায় মা-বাবা বেরিয়ে গেলেন। টিপু পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে পুব দিকটা হলদে হতে শুরু করেছে দেখে বেরিয়ে পড়ল।

ইস্কুলের পিছনের শর্টকাটটা দিয়ে বিষ্ণুরামবাবুদের বাড়ি পৌঁছতে লাগল মিনিট দশেক। ঘোড়াটা নেই। টিপুর ধারণা ওটা বাড়ির পিছন দিকে আস্তাবলে থাকে। সামনের বৈঠকখানার জানালা দিয়ে আলো রাস্তায় এসে পড়েছে, ঘরের ভিতর চুরুটের ধোঁয়া।

'কিস্তি।'

অঙ্ক স্যারের গলা। দাবা খেলছেন বিষ্ণুরামবাবুর সঙ্গে। তাহলে কি আজ ঘোড়া চড়বেন না ? সেটা জানার কোনো উপায় নেই। লোকটা কিন্তু বলেছে হামলাটুনির মাঠে যেতে। টিপু যা থাকে কপালে করে সেই দিকেই রওনা দিল।

ওই যে পূর্ণিমার চাঁদ। এখনো সোনালী, রূপোলী হবে আরো পরে। নেড়া খেজুর গাছটার মাথায় পৌঁছতে এখনো মিনিট দশেক দেরি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না যাকে বলে সেটা হতে আরো সময় লাগবে, তবে একটা ফিকে আলো চারদিক ছেয়ে আছে। তাতে গাছপালা ঝোপঝাড় সবই বোঝা যাচ্ছে। ওই যে দূরে ভাঙা কুঠিবাড়ি। ওর পিছনে কোথায় থাকে লোকটা ?

টিপু একটা ঝোপের পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করার জন্য তৈরি হল। তার প্যান্টের পকেটে খবরের কাগজে মোড়া এক টুকরো পাটালি গুড়। টিপু তার

খানিকটা মুখে পুরে চিবোতে লাগল। শেয়াল ডাকছে দূরের বন থেকে। আকাশ দিয়ে যে কালো জিনিসটা উড়ে গেল সেটা নিশ্চয়ই পেঁচা। গরম কোটের উপর একটা খয়েরি চাদর জড়িয়ে নিয়েছে টিপু। তাতে গা ঢাকা দেওয়ারও সুবিধে হবে, শীতটাও বাগে আসবে।

আটটা বাজার যে শব্দটা এলো দূর থেকে সেটা নিশ্চয়ই বিষ্ণুরামবাবুদের ঘড়ির শব্দ।

আর তার পরেই টিপু শুনতে পেল—খট্‌মট্-খট্‌মট্-খট্‌মট্-খট্‌মট্...

ঘোড়া আসছে।

টিপু ঝোপের পাশ দিয়ে মাথাটা বার করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মোড়ের দিকে।

হ্যাঁ, ঘোড়া তো বটেই, আর তার পিঠে নরহরি স্যার।

কিন্তু ঠিক এই সময় ঘটে গেল একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। একটা মশা কিছুক্ষণ থেকেই টিপুর কানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল, টিপু হাত চালিয়ে সেটাকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু হঠাৎ সেটা সুড়ুৎ করে ঢুকল গিয়ে তার নাকের ভিতর।

দু আঙুল দিয়ে নাক টিপে যে হাঁচি চাপা যায় সেটা টিপু আগে পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু এখন নাক টিপলে মশাটা আর বেরোবে না মনে করে সে হাঁচিটা আসতে দিল, আর তার শব্দটা খোলা মাঠের শীতের রাতের থমথমে ভাবটাকে একেবারে খান্‌খান্‌ করে দিল।

ঘোড়া থেমে গেছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল টিপুর উপর।

'তর্পণ!'

টিপুর হাত পা অবশ হয়ে গেছে। সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ছি ছি ছি! এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ভেস্তে দেওয়াতে লোকটা না জানি কী মনে করছে!

ঘোড়াটা এগিয়ে আসছিল তারই দিকে, পিঠে অঙ্ক স্যার, কিন্তু এমন সময় স্যারকে প্রায় পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ঘোড়াটা সামনের পা দুটো তুলে একটা আকাশচেরা চিঁহিহি ডাক ছেড়ে এক লাফে রাস্তা থেকে মাঠে গিয়ে পড়ল।

আর তার পরেই টিপুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, দেখে যে ঘোড়া আর মাটিতে নেই।

ঘোড়ার দুদিকে দুটো ডানা। সেই ডানায় ঢেউ তুলে ঘোড়া আকাশে উড়তে লেগেছে, অঙ্ক স্যার উপুড় হয়ে ঘোড়ার পিঠ জাপটে ধরে আছেন, তাঁর জ্বলন্ত টর্চ হাত থেকে পড়ে গেছে রাস্তায়। চাঁদ এখন খেজুর গাছের মাথায়, জ্যোৎস্না এখন ফুটফুটে, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে অঙ্ক স্যারকে পিঠে নিয়ে বিষ্ণুরাম দাসের ঘোড়া আকাশভরা তারার দিকে উড়তে উড়তে ক্রমেই ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে।

পেগ্যাসাস!

ধাঁ করে টিপুর মনে পড়ে গেল।

গ্রীসের উপকথা। রাক্ষসী মেডুসা—তার মাথায় চুলের বদলে হাজার বিষাক্ত সাপ, তাকে দেখলে মানুষ পাথর হয়ে যায়—তরোয়াল দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলল বীর পারসিয়ুস, আর মেডুসার রক্ত থেকে জন্ম নিল পক্ষিরাজ পেগ্যাসাস।

'তুমি বাড়ি যাও, তর্পণ।'

পাশে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত লোকটা, চাঁদের আলো তার মাথার সোনালী ঝুঁটিতে। —'এভরিথিং ইজ অল রাইট।'

তিনদিন হাসপাতালে ছিলেন অঙ্ক স্যার। শরীরে কোনো জখম নেই, খালি মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন, জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেন না।

চারদিনের দিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অঙ্ক স্যার টিপুদের বাড়িতে এলেন। বাবার সঙ্গে কী কথা হল সেটা টিপু জানে না। অঙ্ক স্যার চলে যাবার পরেই বাবা টিপুকে ডাকলেন।

'ইয়ে, তোর বইগুলো নিয়ে যা আমার আলমারি থেকে। উনি বললেন ওসব গল্পে ওঁর আপত্তি নেই।'

সেই লোকটাকে আর দেখেনি টিপু। তার খোঁজে একদিন গিয়েছিল কুঠিবাড়ির পিছনটায়। পথে যেতে দেখেছে বিষ্ণুরামবাবুর ঘোড়া যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু কুঠিবাড়ির পিছনে কিচ্ছু নেই।

শুধু একটা গিরগিটি দেখতে পেয়েছিল টিপু, যেটার রং একদম গোলাপী।

suman_ahm@yahoo.com
For More Books Visit www.murchona.com
Murchona Forum : http://www.murchona.com/forum/index.php